Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রনাথ: একটি সমীক্ষা (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ-১৩৯৩ বঙ্গাব্দ)

সুলতা মণ্ডল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/5_Sulata-Mondal.pdf

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পর ‘বিশ্বভরতী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রী প্রমথ চৌধুরী। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন প্রাবন্ধিকগণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা, সংগীতভাবনা, চিত্রশিল্প বিষয়ে তাঁর অনুরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলি এই পত্রিকার আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিত একাধিক চিঠিপত্র পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি সংরক্ষণের চেষ্টা পত্রিকায় লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যচিন্তা, সংগীতভাবনা, চিত্রশিল্প, চিঠিপত্র

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সেই বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় ‘বিশ্বভারতী’ পত্রিকা। তাই এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চর্চিত হবেন সেটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র জন্মলগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রথম সম্পাদনা করেন প্রমথ চৌধুরী। ৭অগস্ট প্রমথ চৌধুরীকে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এই দিনটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে এই দিনটি যেমন প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন অন্যদিকে এই দিনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ঘটে। প্রমথ চৌধুরী ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র সম্পাদকের পদ আলোকিত করলেও সহ-সম্পাদক হিসেবে এই পত্রিকার কার্যভার তুলে নেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং পুলিনবিহারী সেন। সম্পাদক মণ্ডলীর মতামত থেকে একথা স্পষ্ট যে চরম অশান্তির সময় মানুষ যে বিশ্বশান্তি অন্বেষণ করেন তা নিহিত থাকে বিশ্ব Cultureএর মধ্যে। তাই মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন। তারই প্রমাণ হিসেবে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র নাম করা যায়। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রকাশের লক্ষ সম্পর্কেও সম্পাদক মণ্ডলী লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত লক্ষ ছিল সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টকার্য সম্পন্ন করেছেন তাঁদের আসন শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপায় রূপে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় যাঁদের লেখা স্থান পায় তাঁদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের লেখা প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় শান্তিনিকেতনের বাইরেও যাঁরা এই লক্ষ্যে নিজেদের ব্যাপ্ত রেখেছিলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত হয়।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রকাশের ধারাটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ মাস থেকে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস পর্যন্ত বারোটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসেই একটি করে সংখ্যা বের হয়। কিন্তু ১৩৫০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে এই পত্রিকা প্রকাশের ঘটনার পরিবর্তন হয়। শ্রাবণ মাস থেকে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র বর্ষ আরম্ভ হওয়ায় বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাগুলি হলো — শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-

আষাঢ়। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই সম্পাদকের বদল ঘটেছে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের এই ধারার পরিবর্তন হয়নি।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় নানান গুণী ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো একটি বিশেষ দিক নয়, বলা যেতে পারে সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্র-মানসিকতাকে তুলে ধরা ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত কোনো কিছুই এই পত্রিকার লেখকগণের আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। এই পত্রিকায় বিভিন্ন জ্ঞানী মানুষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পত্র আদান-প্রদান করতেন তা প্রকাশিত হয়েছে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য়। আরো উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু গানের অপ্রকাশিত স্বরলিপি ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র প্রতিটি সংখ্যায় একটি করে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণকেন্দ্র বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক লেখা যে বিশেষ প্রাধান্য পাবে তা বলার অবকাশ রাখে না।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প, রবীন্দ্রসঙ্গীত ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য়।

রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট সাহিত্য প্রাবন্ধিকদের রচনায় নানাভাবে ধরা দিয়েছে। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের কাছে নমস্য। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ এমন একটি পত্রিকা, যেখানে রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষক এবং বিদ্বান ব্যক্তির লেখা রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প বিষয়ক গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাটক নিয়েও এই পত্রিকায় বহু মানুষ আলোচনা করেছেন। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প বা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি। রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখকগণ ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই পত্রিকায় একাধারে যখন প্রমথনাথ বিশী ‘রক্তকরবী’, ‘ভগ্নহৃদয়’, ‘রাজা’, এবং বিমল চন্দ্র সিংহ ‘বলাকা’র যুগ প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটক, কাব্যকে আলোচনা করেছেন তখনই রবীন্দ্রসাহিত্যকে নতুন রূপে দেখার চেষ্টা করেছেন অশোকবিজয় রাহা তাঁর ‘রবীন্দ্র কাব্যে ইন্দ্রিয় চেতনার মিশ্রণ ও রূপান্তর’ নামক প্রবন্ধে। নতুন ভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যকে দেখার চেষ্টা লক্ষ করা যায় অশ্রুকুমার সিকদার রচিত ‘রবীন্দ্র উপন্যাস, তার আধুনিকতা’, ‘রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প’, আবু সায়ীদ আইয়ুব রচিত ‘কাব্যে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’, সমীরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘রবীন্দ্র রচনায় সত্য ও তত্ত্ব’ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রসাহিত্যের মহৎ দিকগুলি যেমন তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিকরা ঠিক তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যকে কেউ কেউ সমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র সেন রচিত ‘রবীন্দ্র সাহিত্যে অশোক’ প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ রাখে। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, অশোক ভারতবর্ষের একটি আদর্শ চরিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে অশোকের স্থান নেই। বৌদ্ধ কাহিনি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ‘মালিনী’, ‘নটীর পূজা’, ‘চণ্ডালিকা’ রচনা করেছেন। সামান্য পশুবলির দুঃখ থেকে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস, ‘বিসর্জন’ নাটক লিখেছেন। অথচ কলিঙ্গ যুদ্ধে নরবলির বেদনা সম্রাট অশোককে যেভাবে অনুশোচনাগ্রস্ত করেছিল তার ভিত্তিতে কোনো লেখা রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীতে অশোককে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করলেও রবীন্দ্রসাহিত্যে সম্রাট অশোক কেন আত্মপ্রকাশ করতে পারলেন না এ প্রশ্ন থেকে যায়।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘রক্তকরবী’ প্রবন্ধে ‘রক্তকরবী’ নাটকের মূল

তত্ত্বকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে ‘রক্তকরবী’ নাটক হয়ে উঠেছে কৃষিনির্ভর সভ্যতার সঙ্গো যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার সমস্যার দ্বন্দ্ব। এক্ষেত্রে তিনি ‘রামায়ণের’ সীতা ও ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীকে এক করে দেখেছেন। উভয় রচনার মূল দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গো যন্ত্রের। আর রবীন্দ্রনাথ ‘রামায়ণের’ সঙ্গো ‘রক্তকরবী’র সম্পর্ক প্রসঙ্গো বলেছেন —

“রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গো এর যে একটা মিল দেখেছি তার কারণ এই নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বলা প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা যে বর্তমান কালেরই হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।”[১]

নন্দিনীকে প্রমথনাথ বিশী আনন্দদায়িনি বলেছেন। নন্দিনীর সঙ্গো নিরক্তকরবীকে তিনি মিলিয়েছেন। নন্দিনী যার মানবী রূপ তারই প্রতীক রূপ রক্তকরবী। যক্ষপুরীর যন্ত্রকেন্দ্রিক সমাজে নন্দিনীর উচ্ছ্বলতা প্রাণসত্তাকে টিকিয়ে রাখে। আবার রবীন্দ্রনাথের ঘরের কাছে লোহালক্কড়ের আবর্জনার স্তূপ থেকে লাল ফুল বুকে করে একটি করবী শাখা ঘোষণা করে সে মরেনি, তাকে কেউ মারতে পারেনি। এ যে প্রাণের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে রাখে। এই প্রবন্ধটি ‘রক্তকরবী’ নাটককে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। এই ভাবেই ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা সমালোচনা লক্ষ করা যায়। প্রবান্ধিকরা কোথাও রবীন্দ্রনাথের মতকে অনুসরণ করে মত প্রকাশ করেছেন, কোথাও তাঁর সাহিত্যকৃতির অসম্পূর্ণ দিককে তুলে ধরেছেন। যাই হোক এতে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা এই পত্রিকায় যে নানান দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে একথা বলতেই হয়।

বহুগুণের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ একথা সকলের জানা। এই বহুগুণের মধ্যে একটি হলো চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গান, গল্প আমাদের কাছে পরিচিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র অনেকের কাছেই অধরা। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’ এমন একটি পত্রিকা যেখানে রবীন্দ্রচিত্রকলাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্প বিষয়ক মনোভাবকে তুলে ধরার জন্য বেশ কিছু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বহুগুণী মানুষেরা এই প্রবন্ধগুলির রচয়িতা। এই রকমই একটি প্রবন্ধ হলো ‘আর্ট প্রসঙ্গ’। ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননে রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সম্পর্কে যে ভাবনা উঠে আসে তারই একটি সংকলন এই প্রবন্ধখানি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের চিত্র কোনো নতুন জিনিস ছিল না। অবন ঠাকুর মনে করেন তাঁর রবিকাকার ছবিতে যা আছে তা আগে থেকেই প্রাকৃতিতে ছিল। লুকানো সামগ্রী থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রশিল্পের উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে ভাবের প্রবণতা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। মোগল ছবি, পারসিয়ান ছবি, অজন্তার ছবির ধরাবাঁধা নিয়মকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন অভিনব চিত্র, যাকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে ‘ভলকনিক ইরাপশন’ বলে মনে করেছেন।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত প্রতিমা দেবীর ‘গুরুদেবের ছবি’ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিমা দেবী জানিয়েছেন শ্রীমতি মীরাদেবীকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

“চিত্র বিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখতুম আমি কি করতে পারতুম।”[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকার জন্য হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়ে আঁকতেন। ভালো রঙের ধারও তিনি ধারতেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা থেকেই জানা যায় ছবি আঁকার সময় পূর্বানুভূতি কিছুই তাঁর মনে থাকত না। কলম চলার সঙ্গো সঙ্গো কলমের মুখে তাঁর চিত্রও তেমনি ফুটে উঠত। প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের ছবি এক্জিবিশনের পর পল ভেলরি এবং আঁদ্রে জিদ্ তাঁর ছবির প্রশংসা করে বলেছেন, তাঁদের দেশে আর্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছবির ভিতর নতুনকে পাওয়ার যে চেষ্টা চলছিল তাকেই রবীন্দ্রনাথ চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ছবি আঁকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন —

“... জীবন গ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবন দেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।”[৩]

অর্থাৎ ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘শেষ বয়সের প্রিয়া’ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছবি ছিল নেশার মতো। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে ছবি আঁকার কথা ভাবতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন কবিতার রবীন্দ্রনাথ ও ছবির রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন।

‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় অপ্রকাশিত গবেষকদের লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে ছবির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা চেতনাকে কীভাবে পরিচালিত করেছেন তার একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট উঠে আসে প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য বর্তমানের বিভিন্ন গবেষকও রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় শ্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের মনের গতি বোঝবার জন্য ছবির বিশেষ মূল্য আছে। এ কথার সমর্থন লক্ষ করা যায় বিখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। তিনি বলেছেন, ছবি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক হালকা সখের সামগ্রী ছিল না। শিল্প ও জীবন ছিল তাঁর কাছে ‘রক্ত সূত্র গাছি দিয়ে বাঁধা।’ তাঁর আঁকা ছবি দেখলে বোঝা যায় সেগুলি শৌখিন গৃহশোভা নয়, প্রাণের উত্তাপে জীবনধর্মী। তাঁর রচনায় তিনি আরো বলেছেন যে রবীন্দ্র-সৃষ্টি সাধনার শেষ পর্যায়ের ফসল হলো চিত্রকলা। জীবনের উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ সার্ধদ্বিসহস্র সৃষ্টির অপ্রত্যাশিত আর্বিভাব ঘটালেন তা শুধু চিত্রকলার ইতিহাসে নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’র ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে একথা বলতেই হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা যেমন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তেমনি রবীন্দ্র সংগীতানুরাগী ব্যক্তির সংখ্যাও নিছক কম নয়। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কৌতূহলও মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তির গবেষণালব্ধ রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়েছে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য়। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, স্বপ্না মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত কেন্দ্রিক নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী তাঁর ‘বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত’ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রবীন্দ্রসংগীতকে বাঁচাতে হলে স্বরলিপি লেখা, শেখা ও শেখানো অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন। নিজের গানের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের স্বরলিপি নিজেই শোনাতেন। এ তথ্যও এই প্রবন্ধ থেকেই জানা যায়। নিজের গানের বিকৃতি যে তিনি পছন্দ করতেন না তারও প্রমাণ পাওয়া যায় অন্যত্র। জানকীনাথ বসুকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি তাঁর গান অন্যের ইচ্ছামত ভঙ্গি দিয়ে গাওয়ার বিরোধীতা করেছেন কারণ তাঁর মতে এতে গানের স্বরূপ নষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিখিয়ে দিতেন। স্বরলিপি কোথাও লিখে রাখতেন না। তাই রবীন্দ্রসংগীতকে সঠিক প্রয়োগের জন্য স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। এ বিষয়ে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর চিন্তা ভাবনা অবশ্য উল্লেখের দাবি রাখে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে সবসময় নিজেই সুর আরোপ করেছেন এমন নয়। ইংরেজি, হিন্দি, বাংলার বাউল গানের সুর তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন ভাষার গানের সুর তিনি তাঁর অনেক গানে ব্যবহার করেছেন। ‘বাউল-গান’ প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন তাঁর অনেক গানেই বাউলের সুর আছে এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিনীর সঙ্গে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী লিখিত এবং ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত ‘রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম’, ‘রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান’, ‘হিন্দি ভাঙা’,

রবীন্দ্র সংগীতের তালিকা' প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন্ গানে কোন্ ভাষার সুর ব্যবহার করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় —

মূল।। হরিনাম দিয়ে জগত মাতাল (বাউল)
ভাঙা।। যদি তোর ডাক শুনে কেউ।
মূল।। মহাদেব মহেশ্বর (হিন্দী)
ভাঙা।। মহাবিশ্বে মহাকাশে।
মূল।। Go where glory waits (বিলাতি)
ভাঙা।। আহা, আজি এ বসন্তে।

আবার অন্যদের রচিত গানেও যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর দিয়েছিলেন সেই তথ্যও জানা যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি থেকে। এই 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব', 'রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতি সংগীতের প্রভাব' প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রসংগীতের আঙ্গিককে সুস্পষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস দেখা যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়। তারই প্রমাণ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'একটি লুপ্তপ্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রবন্ধটি।

তাই বলা যায় রবীন্দ্রসংগীত কেন্দ্রিক অনেক জানা-অজানা তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রবন্ধগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগীত বিষয়ক চিন্তাভাবনা এবং রবীন্দ্রসংগীতকে জানতে আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধগুলি।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ — এই সময় পর্বে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় চিঠিপত্র অংশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির যে পত্রালাপ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পত্রের দ্বারা ভাব বিনিময় করতেন সে কথা কারো অবিদিত নয়। তবে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সূত্র ধরে যে ব্যক্তিবর্গের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মোহিতচন্দ্র সেন, মহিমচন্দ্রদেব বর্মন, রাধাকিশোর মাণিক্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মন, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সেন, মীরা দেবী, নন্দিনী দেবী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দনাথ বসু, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, হেমলতা দেবী, কাদম্বিনী দেবী, সতীশচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল ঘোষ, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, ফণীভূষণ অধিকারী, শ্রীমতি ভক্তি দেবী, অরবিন্দমোহন বসু, রাধারানী দেবী, নলিনী বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, অমল হোম, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হেমন্তবালা দেবী, অবলা বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিধানচন্দ্র রায়, রমা কর, সি.এফ.এণ্ড্রুজ, অমিতা ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, পিয়রসন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনেশশন্দ্র সেন, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায় ও হিতেন্দ্রনাথ নন্দী।

লক্ষ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র আদান-প্রদানকারী যে ব্যক্তিবর্গের নাম 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় উঠে এসেছে তাঁরা কেউ সাহিত্যিক, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ রবীন্দ্রনাথের ঘরের মানুষ। শুধু তাই নয়, পত্রিকার সংখ্যাগুলো পাঠ করলে দেখা যায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পত্রগুলি লিখিত। চিঠি হলো মনের দর্পণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তিনি যখন পরিচিত চেনা জগতের বাইরে থাকতেন, তখন তাঁর মনে যে দোলাচলতা চলতে থাকত তারই প্রকাশ ঘটত তাঁর লিখিত পত্রে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত পত্রগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত পত্রগুলিতে রবীন্দ্র-মানসিকতার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। পত্রগুলি ভালো করে পাঠ করলে দেখা যায় কয়েকটি বিষয় বারবার পত্রে উঠে এসেছে। সেগুলি হলো বিদ্যালয় প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনা, পিতৃ স্নেহ ইত্যাদি।

আমাদের সকলের জানা যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছিল প্রাণের সম্পদ। এই বিদ্যালয়কে তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন ঘোচানোর জন্য একটির পর একটি বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই দুই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিদেশে পাড়ি দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিদেশে থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতি মুহূর্তে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্কের উন্নতির কথা ভেবেছেন। বিদেশ থেকে বিদ্যালয়ের উপযোগী বই পাঠিয়েছেন। কখনো বা খেলার ছলে শিক্ষাদান পদ্ধতির উপায় লিখে পাঠিয়েছেন পত্রে। আবার বিভিন্ন জনের সঙ্গে পত্রলাপের সময় তিনি বিদ্যালয়ের যান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপসারণের কথা বলেছেন। তাঁর বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে বিশ্বের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার রূপে গড়ে তোলার বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে চিঠিতে। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভাবনাকে জানতে পত্রগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা প্রকাশেও পত্রগুলি অনবদ্য। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত বেশ কিছু পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সাহিত্য নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। পত্রগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ কাব্য, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের উৎস, ‘অচলায়তন’ নাটক সম্পর্কে সাহিত্যকারের নিজস্ব মতামত পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে বিভিন্ন সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন তারও দৃষ্টান্ত রয়েছে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত পত্রগুলিতে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে পত্রলাপ হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে সেগুলি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রসাহিত্যও যে সমালোচিত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত মেলে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যে পত্রালাপ হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যের বেশ কিছু দিক উন্মোচনে ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’টি গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যের হাত ধরেই যে মানুষটি বিশ্বখ্যাত হয়েছিলেন সেই মানুষটির সাহিত্য-সৃষ্টির জগতকে বাদ দিয়ে যদি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছানো যায় তাহলে দেখা যায় অফুরন্ত পিতৃস্নেহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মীরা দেবীকে লেখা পত্রগুলি থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। পুত্রের শিক্ষা, পুত্রের হাতে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে পিতা রবীন্দ্রনাথকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আবার মীরা দেবীকে লেখা পত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ পুত্রশোকাহত কন্যাকে দুঃখ থেকে উত্তরণের উপায় জানিয়ে যথার্থ পিতার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত পত্রগুলি থেকে পিতা রবীন্দ্রনাথকে যেমন জানা যায় তেমনি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি পুত্র রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা, পিতৃ আদর্শের অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তি যিনি সকল মানুষের আদর্শ। চারিত্রিক সকল সদ্ গুণাবলীর অধিকারী তিনি। তাঁর মানসিকতা এবং জীবন দর্শন সকল মানুষের কাছে গ্রহণীয়। এহেন একজন ব্যক্তির মনোভাব জানার জন্য তাঁর লিখিত পত্রগুলি পড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ চিঠির মধ্য দিয়েই মানুষের অন্তরের ভাবনা প্রতিফলিত হয়। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্য দিয়ে একাধারে আমরা সাহিত্য প্রেমী, সাহিত্য সমালোচক, পিতা, শিক্ষক, গুণগ্রাহী, চিত্রশিল্পী, প্রকৃতি প্রেমিক, ভ্রমণকারী সর্বোপরি পথপ্রর্দশক রূপে রবীন্দ্রনাথকে পাই।

তাই সবশেষে বলা যায়, ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক চিঠিগুলি আলোচনার অন্তরালে থাকলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অধরা রয়ে যেতেন অনেকখানি। ‘বিশ্বভারতী পত্রিকা’য় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা করার সময় যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অবহেলা করা হয় বললে অত্যুক্তি করা হবে না, তা হলো রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গান রচনা করেছেন। কিন্তু কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে গানকে করে তুলেছেন রসগ্রাহী। সেই গান আজ বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অনুরণিত হচ্ছে। সুখে, দুঃখে, আনন্দে উৎসবে রবীন্দ্রসংগীতকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু স্বরলিপি ব্যতীত রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণ করা ছিল দুঃসাধ্য। আবার রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বরলিপি রচনায় ছিলেন প্রথম থেকে উদাসীন। কিন্তু স্বরলিপির অভাবে রবীন্দ্রকণ্ঠ নিঃসৃত সংগীত যা এক অমূল্য সম্পদ তা হারিয়ে যাবে এমন তো হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরে গীত সংগীতকে স্বরলিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন কিছু সংগীত প্রেমী গুণী মানুষ। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই তৈরি হয় রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র স্বরলিপি অংশটি নিঃসন্দেহে আলোচনার আলোকে উপস্থাপনের অবকাশ রাখে। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদকগণকে এই প্রয়াসের বাহবা দিতেই হয়।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত চিত্রসূচি অংশটিও উল্লেখের দাবি রাখে। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র চিত্রসূচি অংশে বিবিধ চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বেশ কিছু চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে কোনোটি রবীন্দ্রনাথের নিজের অঙ্কিত চিত্র, কোনোটি বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি কোনোটি রবীন্দ্রসাহিত্যকে অবলম্বন করে অঙ্কিত চিত্র।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৯৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস অবধি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রকাশিত সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এক উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পর্কও বেশ ঘনিষ্ঠ। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদকদের মতামত অনুসারেও 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এই আলোচ্য প্রবন্ধে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতিভা কোনো ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ নয়। বিস্তৃত তার পরিধি। কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, সংগীত, চিত্র — সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক আবার অন্যদিকে সংগীতস্রষ্টা এবং চিত্রশিল্পী। তাঁর সকল রূপের প্রকাশ ঘটেছে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথকে বিষয় করেই যে শুধুমাত্র প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তা নয়, রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা, ছিন্নপত্রাবলীর পত্রসমূহ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র অনেকখানি জায়গা জুড়ে অবস্থান করছেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নানা চর্চা হলেও রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' তার স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' এমন একটি পত্রিকা যেখানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি মূলত গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনার উজ্জ্বল নির্দশন। গবেষণা শব্দের অর্থ তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধান। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র লেখকগণের অনুসন্ধিৎসু মন তাই বারবার রবীন্দ্রনাথকে জানতে চেয়েছে। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় নানাবিধ আলোচনা আমাদের সামনে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উপস্থিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সেই নানাবিধ প্রবন্ধগুলি তৎকালেই অর্থাৎ শুধু 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র লেখকগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিষয়গুলি উদ্ভাবন করেছেন সেগুলিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে, এমনকি আজ অবধি নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা কার্যের যে অন্ত নেই সে কথা বলাইবাহুল্য। দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিভিন্ন দিক উন্মোচনে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রবন্ধগুলিকে মূল কেন্দ্রে রেখে রবীন্দ্ররচনাবলীর সহায়তা নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির রচিত গ্রন্থগুলিকে পাথেয় করে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে দেখার চেষ্টা হয়েছে এই প্রবন্ধে। ফলে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানার অদম্য কৌতূহলের কিছুটা নিরসন সম্ভব হয়েছে বলে আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. 'রবীন্দ্ররচনাবলী', অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ.৭১৫
২. 'গুরুদেবের ছবি', প্রতিমাদেবী, ভাদ্র ১৩৪৯
৩. 'চিঠিপত্র ৩', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৯৩

গ্রন্থঋণ :

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা (শ্রাবণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ — আষাঢ় ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), বিশ্বভারতী, কলকাতা
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সংগীত-চিন্তা’, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘চিঠিপত্র (১-১১)’, বিশ্বভারতী, কলকাতা
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রবীন্দ্ররচনাবলী সুলভ সংস্করণ(প্রথম-অষ্টাদশ খণ্ড)’, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৌষ, ১৪১৭
৫. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্র-চিত্রকলাঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা’, দে’জ পাবলিকেশন

লেখক পরিচিতি : ড. সুলতা মণ্ডল, বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের প্রাক্তন গবেষক, বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা